সামবেদ সংহিতা – দ্বিতীয় অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সামবেদ সংহিতা

সামবেদ সংহিতার তিনটি প্রধান পাঠভেদ রয়েছে–জৈমিনীয়, রাণায়নীয় এবং কৌথুম। শেষোক্ত পাঠটি গুজরাট ও বাংলায় প্রচলিত ছিল; রাণায়নীয় শাখা, বিশেষত তাদের কল্পসূক্তগুলি, প্রধানত মহারাষ্ট্রে পরিচিত ছিল–অবশ্য এই শাখা কৌথুম শাখার সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ব্যবহার করে থাকে। জৈমিনীয় শাখার সমস্ত ভাগই সম্পূর্ণত কর্ণাটকে প্রচলিত।

সামবেদের ছ'টি মূল পাঠ রয়েছে :

- সামবেদ
  - আর্চিক
    - গ্রাম (গেয়) গান
    - অরণ্য (গেয়) গান
  - উত্তরাষ্টিক
    - ঊহগান
    - ঊহ্যগান

মূল পাঠের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বৈদিক সাহিত্যে সামবেদের তাৎপর্য সবচেয়ে গৌণ। মোট ১৮১০ টি মন্ত্রের মধ্যে (পুনরাবৃত্তিগুলি গ্রহণ না করলে ১৫৪৯) ১৭৩৫টি

মন্ত্র (বা ১৪৭৪) প্রধানত ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে অবিকৃত পাঠে সরাসরি নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫টি মন্ত্রের অধিকাংশ পঙ্‌ক্তিই যজুর্বেদ বা অথর্ববেদ থেকে অংশত গৃহীত হয়েছে; যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক পুস্তক বা লুপ্ত শাখা থেকে কিছু কিছু পঙক্তি নেওয়া হয়েছে। এগুলিকে কৃত্রিমভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে অর্থহীন বিশৃঙ্খল পঙক্তি বিন্যাসে পরিণত করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করা হলেও সামবেদে তাদের পাঠ ভিন্ন। সংহিতা পাঠের এই পরিবর্তন সম্ভবত পুরোহিতদের ইচ্ছাকৃত পুনর্বিন্যাসের ফলেই হয়েছিল; এই পাঠ প্রাচীনতর বলেই ঋগ্বেদের প্রচলিত পাঠ অপেক্ষা বহু পূর্ববর্তী। আবার কোনো সমালোচকের মতে সামবেদ সংহিতা। ঋগ্বেদের পরে সংকলিত হয়েছিল ব'লেই তাতে ভাষাগত বিকাশের পরবর্তী স্তরটি প্রতিফলিত হয়েছে। সামবেদেব পুরোহিত উদগীতা, যজ্ঞে গায়ক ছিলেন ব'লেই সাংগীতিক বা সুরবিন্যাসের প্রয়োজনে মূলপাঠে পরিবর্তন করতে হয়েছিল; অবশ্য কোনো কোনো গবেষকের মতে এই জাতীয় পরিবর্তনে কোনো পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি।

সামবেদের পুরোহিতের সহায়ক গ্রন্থরূপেই এই নূতন পাঠ সংকলনটি প্রস্তুত হয়েছিল; নবীন গায়কদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানে সংগীতের প্রয়োজনে এই পাঠ আদর্শ রূপে গণ্য হত। সামবেদ সংহিতা আর্চিক (বা পূর্বাচিক) এবং উত্তরার্চিক নামে দুটি ভাগে বিন্যস্ত। আর্চিক অংশে ১৮৫৩টি মন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে প্রত্যেকটি প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক সুরে গীত হতে পারত। এই সংকলন ছ'টি প্রপাঠকে বিভক্ত (অথবা বারোটি অর্ধ বা অর্ধ-প্রপাঠকে)। মোটামুটিভাবে প্রপাঠকগুলি আবার ৫৯টি দশৎ-এ বিভক্ত। এদের সঙ্গে আরও দশটি অতিরিক্ত একটি দশৎ সংযোজিত হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরার্চিকে সংকলনের চারশটি সূক্তে ১২২৫টি মন্ত্র ৯টি প্রপাঠকে বিন্যস্ত; এগুলিও আবার ২টি (ভিন্ন একটি গণনায় ৩টি) দশৎ-এ উপবিভক্ত–প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের মন্ত্র সামবেদের স্বরন্যাস অনুযায়ী পরিকল্পিত। পূর্বার্চিকের শ্লোক সংখ্যা ৫৮৫।

আর্চিক সংকলন ভাবী উদগাতা শ্রেণীর গায়ক বা তার কোনো সহায়কের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিল ব'লে প্রত্যেকটি সূক্তের প্রথম অংশ সুর-সৃষ্টিতে স্মৃতির অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত–উত্তরার্চিকে সংকলিত মন্ত্রসমূহ। কিন্তু স্তোত্ররূপে বিন্যস্ত। মাত্র ৩১টি মন্ত্র ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত মন্ত্রই ঋগ্বেদে খুঁজে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রধান শ্রীেত যজ্ঞসমূহে যে ক্রম অনুযায়ী সেগুলি গীত হ'ত তা উত্তরার্চিকেই রক্ষিত হয়েছে।

মন্ত্রসমূহে প্রযুক্ত সুরের কাঠামো ইতোমধ্যে সর্বজনপরিচিত হয়ে গিয়েছিল, এই পূর্বসিদ্ধান্ত থেকেই যেন উত্তরার্চিক যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ সূক্ত সংগ্রহরূপে গড়ে উঠেছে। সুতরাং আর্চিক অংশে যেখানে প্রশিক্ষার্থীদের সংগীত বিষয়ে পাঠ দেওয়া হত, উত্তরার্চিক সেই সমস্ত গানের ব্যবহারিক ও যজ্ঞানুষ্ঠানে সহায়ক গ্রন্থরূপে সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি বিন্যস্ত। পূর্বাচিকে প্রথম পর্যায়ে তুচগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বাচিক এবং অরণ্যসংহিতা একত্রে দ্বিবিধগান অর্থাৎ গ্রাম-গেয় এবং অরণ্য-গেয় গানের মূল পাঠ নির্মাণ করেছে; তবে যে গানটি একবার গ্রাম-গেয় গানে উল্লিখিত হয়েছে, তা অরণ্য-গেয় গানে নতুন সুরে গীত হলেও অরণ্য সংহিতায় দ্বিতীয়বার আর বিধৃত হয় নি।

যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহ জটিলতর ও দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়োগিক সমস্যাগুলিও বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল; ঐতিহাকে বিশ্বস্তভাবে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনে শিক্ষানবীশদের স্পষ্ট প্রশিক্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে দুটি আর্চিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি গীতিসংকলন তৈরি হল : (১) (গ্রাম) গেয় গান বা প্রকৃতি গান (২) অরণ্য (গোয়) গান (৩) ঊহগান এবং (৪) ঊহ্যগান। এদের মধ্যে প্রথম দুটি যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংকলিত গান পূর্বাচিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সাধারণভাবে সোমযাগেই ব্যবহৃত। গ্রামে গুরুগৃহে প্রকাশ্যে যা শেখা যায়, তারই নাম দেওয়া হয়েছে গ্রাম গেয় গান, অন্যদিকে অরণ্যের নির্জনতায় যা শেখানো হয়, তাকেই বলে অরণ্য গেয় গান। গ্রামগীতির কিছু কিছু পাঠ ভিন্ন সুরে অরণ্যগীতিতেও পরিবেশিত হয়ে থাকে; কিন্তু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানবিষয়ক গীতি-সংকলন যে অরণ্য সংহিতা তাতে সে সব পাওয়া যায় না। গ্রামগীতি ও অরণ্যগীতি একত্রে পূর্বগানরূপে পরিচিত। উত্তরার্চিকটি ঊহগান ও ঊহ্যগানের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ঊহ্যগান স্পষ্টতই অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠান সম্পর্কে সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ-দানের উদ্দেশে রচিত হয়েছিল; উদ্গাতার ব্যহত প্রধান গানগুলি এতে পাওয়া যায়-সাধারণত প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা শ্রেণীর পুরোহিতরা এতে উদ্গাতার সহায়ক হয়ে থাকেন। আর্ষেয়কল্প গ্রন্থে অগ্নিষ্টোমে ব্যবহৃত ঊহ ও ঊহ্যগান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। পূর্বার্চিকে প্রযুক্ত উত্তরার্চিকের প্রতিটি ঋক "যোনি" অর্থাৎ উৎস বলে পরিচিত ছিল, কেননা তখনকার যুগে এই বিশ্বাস ছিল যে শব্দ থেকেই সুরের জন্ম হয়। অতএব গানের কথাই গানের "যোনি"। প্রশিক্ষার্থীদের সহায়ক গ্রন্থরূপে পূর্বাচিক এই সমস্ত 'যোনি'কে আনুষঙ্গিক সুরের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছে। উত্তরার্চিক যেহেতু

আনুষ্ঠানিক প্রয়োগের ক্রম অনুযায়ী এদের বিন্যস্ত করেছে, তাই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, প্রাগুক্ত গানসমূহের সঙ্গে পাঠকের পূর্ব-পরিচিতি স্বতঃসিদ্ধ। তবে উত্তরার্চিকের ২৮৭টি তৃচের মধ্যে পূর্বার্চিকে কেবলমাত্র ২২৬টিই পাওয়া যায়; অন্য ৬১টি না পাওয়ার কারণ এই যে, এইগুলি গায়ত্রীসুরে সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রাতঃসবনে প্রযুক্ত হত। সম্ভবত এই প্রাতঃসবন ছিল মৌলিক ও সংক্ষিপ্ততম সোমন্যাগের প্রথম স্তর, অন্য দুটি সবন পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়। পূর্বোক্ত ২২৬টি তৃচ মাধ্যান্দিন ও সান্ধ্য সবনে ব্যবহৃত হত। অবশ্য গীতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বহুলাংশে অনুমাননির্ভর; বহু পরবর্তীকালের পুস্তকসমূহে প্রাপ্ত পরস্পরবিচ্ছিন্ন নির্দেশগুলি একত্র করেই আমরা কিছু ধারণা তৈরি করেছি।

সামবেদীয় গায়কদের প্রধান কর্তব্যই ছিল ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে সংগীতের প্রয়োজনে পুনর্বিন্যস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে তার নিম্নোক্ত ছটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন-(১) বিকার (একক শব্দগুলির পরিবর্তিত উচ্চারণ) (২) বিশ্লেষণ (শব্দসমূহের বিভাজন।) (৩) বিকর্ষণ (কোন শব্দের বিশ্লিষ্ট অক্ষরসমূহের মধ্যে দীর্ঘায়িত স্বরবর্ণের সন্নিবেশ।) (৪) অভ্যাস (পুনরুক্তি) (৫) বিরাম (পরবর্তী শব্দের বিভাজন করে তার প্রথম অক্ষরকে পূর্ববতী শব্দসমূহের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে সংযোগ–তবে শব্দসমূহের মধ্যে বিরাম চিহ্নদানের পূর্বে তা করণীয়।) (৬) স্তোভ (ঋগ্বেদীয় পাঠে অনুপস্থিত অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ)। এই স্তোভগুলি কেন এবং কখন সামগানগুলির সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল—তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় উৎস সুদূর অতীতে। তখন এইসব অর্থহীন অক্ষরগুলির মধ্যে উদগাতার প্রধান গান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি সমগ্র সমাজের আনন্দিত, গভীর ও উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া বা সম্মতি বা সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিস্ফুট হ'ত–হয়ত বা কোনো ধরনের ঐন্দ্রজালিক ফললাভের প্রত্যাশাও তাতে অভিব্যক্ত হত।

অরণ্যগেয় গান ছ'টি প্রপাঠকে বিভক্ত। অরণ্যগেয় গানের নামকরণেই গ্রামগেয় গানের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট-এই গূঢ়ার্থপূর্ণ সংকলন নির্জনে শিক্ষাদান ও অভ্যাস করানো হ'ত; সম্ভবত এইসব গানের রহস্যময় সম্ভাবনা ও বিপজ্জনক শক্তি আর্যদের কল্পনায় উদ্বোধিত হত। উত্তরটিকের সঙ্গেও ঊহগান ও ঊহ্যগান সংযোজিত হয়েছিল।

উত্তরার্চিকে প্রাপ্ত ঋকবিন্যাস রীতি অনুসরণ ক'রে ঊহগান ২৩টি প্রপাঠকে বিন্যস্ত হয়েছিল; অন্যদিকে উহ্যগানে ছিল মাত্র ৬টি প্রপাঠক।

ঐতিহ্য অনুযায়ী সামবেদের ১০০০টি শাখা ছিল; সম্ভবত এতে এই প্রতীকী বক্তব্যই পরিস্ফুট হয়েছে যে, সুরসৃষ্টি করতে গিয়ে এবং পরবর্তী কালে গানের উপস্থাপনায় সংগীত রচয়িতারা ঐতিহ্যগত পাঠ ব্যবহার গীতস্রষ্টার স্বাধীনতার পরিচয় রেখেছেন। যাই হাোক, আমাদের কাছে মাত্র ৩টি শাখা উপস্থিত হয়েছে–জৈমিনীয় (কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে প্রচলিত) কৌথুম (গুজরাট প্রচলিত–বর্তমানে অবশ্য বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলেও পাওয়া যায়) ও রাণায়নীয় (মহারাষ্ট্রে প্রচলিত, বর্তমানে মথুরাতেও লভ্য)। সামবেদের ভাষ্যকারদের মধ্যে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন মাধব (দ্বাদশ শতাব্দী), ভারতস্বামী (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং শোভাকর ভট্ট (পঞ্চদশ শতাব্দী)।

সামবেদ যে ঋগ্বেদের চূড়ান্ত পর্যায়ের রচনা থেকে কোনো ঋণ গ্রহণ করে নি তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সামগানগুলি মুখ্যত দু'ধরনের; প্রথম গুচ্ছ পরিমান সোমের উদ্দেশে নিবেদিত–অন্যান্য মণ্ডল থেকে কিছু কিছু গৃহীত হলেও প্রধানত ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল থেকেই এইগুলি সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় গুচ্ছটি নিবেদিত হয়েছে। সেই সব দেবতার প্রতি যাঁরা তিনটি সবনে সোমের আহুতি গ্রহণ করেন। বস্তুত গ্রন্থবিচারে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সঙ্গে সামবেদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর্থিক বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি যে কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রগুলি নিবেদিত; অগ্নির প্রতি ৩৫২টি (আগ্নেয় কাণ্ড), ইন্দ্রের প্রতি ১১৯টি (ঐন্দ্র), পবমান সোমের প্রতি ১০টি। প্রজাপতি (মহানামী আর্চিক) ও অন্যান্য দেবতার প্রতি বিবিধবিষয়ক অরণ্য কাণ্ডে যে ৫৫টি মাত্র রয়েছে তাতে উদ্দিষ্ট দেবতাদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্র, বরুশ, পবমান সোম, বিশ্বেদেবাঃ ও অন্ন। উত্তরাটিকে যে ২১টি অধ্যায় রয়েছে, তাতে শেষতম অধ্যায় ছাড়া সর্বত্রই অগ্নি, পবিমান সোম ও ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊষা এবং অশ্বীদের পাওয়া যায়। মিত্রাবরুণকে পাওয়া যায় প্রথম তিনটি ও দ্বাদশ অধ্যায়ে। দশম অধ্যায়ের পর থেকে অন্যান্য দেবতাদের পাওয়া যাচ্ছে :–পবমান সোম (দশম), আদিত্য, আত্মা বা সূর্য (একাদশ), সরস্বত, সরস্বতী, সবিতা, ব্রহ্মণস্পতি, দ্যাবাপৃথিবী

বা হবীংষি, সূর্য (ত্রয়োদশ), বিশ্বেদেবাঃ, অগ্নি পবমান (চতুর্দশ), ইন্দ্রাগ্নী বরুণ, বিশ্বকর্মা, পূষা, মরুৎ, ইন্দ্রাণী (যোড়শ), বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্রাবায়ু (সপ্তদশ), বিষ্ণু বা দেব, ইন্দ্রায়ী (অষ্টাদশ), ঊষা ও অশ্বীরা (উনবিংশ), মরুদগণ, সূর্য বা আপঃ, বায়ুবাত (বিংশ), মরুদগণ, বৃহস্পতি, আপ্বদেবী, ইষবঃ, সংগ্রামাশিষঃ, ব্রহ্মণস্পতি ও অদিতি (একবিংশ)। সমগ্র পঞ্চদশ অধ্যায়টি অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট।

আহুত দেবতাদের পরিচয় অনুযায়ী সামবেদের বিষয়বস্তুকে বর্গীকরণ করে আমরা দেখি যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য কেননা দুটি আর্চিক মিলিয়ে তার উদ্দেশে ৩৭৫টি মন্ত্র নিবেদিত। শুরুত্ব অনুযায়ী এরপর আমরা যথাক্রমে পবমান সোম (১৪০), অগ্নি (১৩৪), প্রজাপতি (১০) ও মিত্রাবরুণ (৬) এর নাম করতে পারি। বৈদিক দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দ্রের সর্বাধিক গুরুত্ব ছিল ব'লেই ঋগ্বেদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মন্ত্রে তার স্তুতি করা হয়েছে; সামবেদেও যে এই গুরুত্ব অক্ষুন্ন ছিল, তা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয়; কেননা সামবেদ ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশকেই বিশেষভাবে অনুসূরণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, সোমযাগের সঙ্গেই তার প্রাথমিক সম্পর্ক এবং ইন্দ্র সোমপায়ীদের মধ্যে প্রধান। পবমান সোম এবং অগ্নি যে শুরুত্বের দিক দিয়ে ইন্দ্রের নিকটতম অনুগামী তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু সোমযাগে পবিমান সোম প্রধান দেবতা আর অগ্নি স্বাভাবিকভাবেই যে কোনও যজ্ঞে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। লক্ষণীয় যে, ঋগ্বেদের কিছু কিছু প্রধান সে তা যেমন ঊষা, অশ্বীরা, সূর্য, পূষা ও সরস্বতী সামবেদে তাদের শুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন এবং অদিতি, সবিতা, ভগ, অংশ, দক্ষ অর্যামা, মার্তণ্ড, ইলা, ভারতী, পর্জন্য, রুদ্র, বাতাঃ যম ও বৃহস্পতি একেবারেই বর্জিত। আবহ-মণ্ডলের দেবতা এবং অধিকাংশ সৌরদেবতাই অনুপস্থিত। এই তথ্যটি সম্ভবত চরিত্রগতভাবে সোমযাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেহেতু সোম এবং অগ্নি—এই উভয়েই ভূস্থান বা পৃথিবীনিবাসী দেবতা। অনুমান করা যায় যে, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরেও একান্তভাবে পুরোহিতের পদ বংশগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তারা প্রাচীনতর সংক্ষিপ্ত সোমচর্যাকে বিস্তৃত করে ব্যাপকতর ও জটিলতর অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তিনটি প্রধান যজ্ঞরীতি অর্থাৎ পশু, সোম ও ইষ্টির মধ্যে শুধু সোম ও ইষ্টিযাগে সাম-গান করা হত; পশুযাগে সামগানের কোনো রীতি ছিল না। যেহেতু পশুপালক জনগোষ্ঠীর পক্ষে পশুযাগই স্বাভাবিক, মনে হয় যে, এটাই ছিল যজ্ঞের প্রাচীনতম রীতি। সেই সঙ্গে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে সামবেদের মধ্যে যেহেতু

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে নবম মণ্ডল পর্যন্ত অংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত, পরবর্তী দুই যজ্ঞ-রীতি যাতে সামগান গাওয়া হ'ত–তার প্রয়োজন অনুসারে সামবেদ সংকলিত হয়েছিল। ইষ্টিযাগ এরই কাছাকাছি সময়ে প্রাথমিকভাবে কৃষিজীবী জনসাধারণের নিজস্ব অনুষ্ঠান রূপে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সোমযাগের সঙ্গে সামবেদের সম্পর্ক কিছুটা বিস্ময়কর। ইরানীয় 'হওম' অনুষ্ঠানের সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে সোমযাগের সুদীর্ঘ ইতিহাসের উৎস সুদূর অতীতে ইন্দো-ইরানীয় অধ্যায় অর্থাৎ অন্ততপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে। তবে যতদিন পর্যন্ত আর্যগণ যাযাবর গোষ্ঠীজীবন যাপন করতেন। ততদিন যজ্ঞ নিশ্চয়ই অত্যন্ত সরল, অসংস্কৃত, আদিম পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভবত প্রত্নভারতীয় আর্যরা এমন সমস্ত অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন সোম যেখানে খুবই পরিচিত ও সহজলভ্য ছিল। উত্তেজক, নেশাপ্রদ ও বিভ্রমউৎপাদক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবত এই পানীয় যুদ্ধরত আর্যদের নিকট খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সোমের সঙ্গে যে ভীতি ও সম্ভ্রমের মনাোভাোব জড়িত রয়েছে, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিহিত উন্মাদনা সৃষ্টির ক্ষমতাই এ জন্য দায়ী। কালক্রমে আর্যরা মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করায় সেই পার্বত্য ভূমি থেকে অনেক দূরে তারা উপস্থিত হলেন সোম যেখানে স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হত। আনুষ্ঠানিকভাবে একজন শূদ্রকে যজ্ঞের প্রয়োজনে সোম সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হত; এতে মনে হয়, দুর্লভতর ফলে সোম অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তী কালে সোম যে 'অতিথি' বিশেষণটি লাভ করে তাতেও এই তথ্য প্রচ্ছন্ন যে তৎকালীন আর্যাবর্তে সোম স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হত না। বহুদূর থেকে নিয়ে আসতে হত ব'লেই সোম 'অতিথি' ও 'রাজা' বিশেষণে ভূষিত হয়। সোমপানজনিত আনন্দের প্রেরণায় সোমযাগ ক্রমশ প্রলম্বিত ও জটিলতর হয়ে শেষপর্যন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার সোমযাগে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন; অনুক্রমণী গ্রন্থ-সমুহের মতে কশ্যপ পরিবারভুক্ত ঋষিরা সর্বাধিকসংখ্যক সূক্ত সোমদেবের উদ্দেশে রচনা করেছিলেন। এছাড়া আমরা অঙ্গিরা (২৩টি সূক্ত), ভৃগু (১২) এবং কণ্ব-বংশীয় পুরোহিতদের কথাও রচয়িতার তালিকায় উল্লেখ করতে পারি। আরও অনুমান করা যায় যে কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার বিশেষ কয়েকটি সুরে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে সামগানের বিশেষ নামকরণ হয়েছে। যেমন বৃহৎ, রথন্তর, বৈরাজ, বৈরূপ, বৈখানস, প্রজাপতের্হৃদয়, শ্লোক, অনুশ্লোক, ভদ্র, রাজা, অর্কৎ, ইলান্দ, শ্বেত, নৌধস, রৌরব, যৌধজয়, অগ্নিষ্টোমীয়, ভাস, বিকর্ণ প্রভৃতি।

সামবেদের কিছু কিছু ঋষির নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : মেধাতিথি, দেবাতিথি, উপস্তুত, বৃহদুকথ, ত্রিমতি, সুক্তি, প্রগাথ, প্রিয়মেধ, নৃমেধ, প্রমেধ, সুমেধ, শোক, সশোক, ত্রিশোক প্রভৃতি। এই নামগুলির অধিকাংশই সোমের সঙ্গে সম্পর্কিত বুদ্ধিমত্তা, প্রশংসা ও প্রতিভাদীপ্ত–এই বিশেষণগুলি অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীনতম পরিবারিক মণ্ডলগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত কাণ্ব, গৌতম, মধুচ্ছন্দা, বামদেব, অত্রি ও ভরদ্বাজ প্রমুখ পরিচিত ঋষিদের নাম যেমন পাওয়া যায় তেমনি কিছু কিছু নাম স্পষ্টতই আর্যবৃত্তবহির্ভূত–ইরিমিরি, ইরিঞ্চি, ইরিমি, মিরি ও রিণু। সম্ভবত কোনো কোনো ঋষি পরিবার স্বতন্ত্রভাবে সংগীত রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই সব গানও সামবেদে সংকলিত হয়েছিল। এঁদের রচনার ইতিহাস যাই হাোক, অন্তত একটি ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠছিল, তখন পুরোহিতদের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপের অংশগুলি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে পুরোহিতদের প্রত্যেকটি শাখাই যথোপযুক্তভাবে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। প্রতিশ্যাখ্য গ্রন্থসমূহ এবং ব্যাকরণের স্বরন্যাসবিষয়ক অধ্যায়গুলি এই তথ্য জানায় যে হাোতা ও তার তিন সহকারী পুরোহিত স্বরবিন্যস্ত আবৃত্তির পদ্ধতি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে। পরবর্তী প্রজন্মকেও একই ভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। অনুরূপভাবে উদগাতা এবং তার তিন সহগায়ক–প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা এবং সুব্রহ্মাণ্য–আনুষ্ঠানিক সংগীতের ঐতিহ্য নির্মান করে তাকে সতর্কভাবে লালন করতেন। শুধু শিল্পকলার প্রয়োজনেই যত্ন ও দক্ষতা প্রদর্শিত হয় নি; জীবিকার প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা অর্জনের জনাও গায়কগণ পরস্পরের মধ্যে চারুতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। যেহেতু কিছু কিছু প্রধান ঋগ্বেদীয় দেবতার শুরুত্ব খর্ব হয়েছিল এবং কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গিয়েছিলেন—বিষয়বস্তুরূপে দেবতাদের পূর্বগুরুত্ব আর বজায় ছিল না; তার পরিবর্তে গায়ক পরিবারগুলি দ্বারা আবিষ্কৃত, অভ্যস্ত, পরিশীলিত, পরিবর্ধিত, বিশেষীকৃত এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত রীতিমূর্ছনার গ্রহণ ও বর্জনই মুখ্য গুরুত্ব লাভ করল।

ছন্দ ও ভাষা

ছন্দ ও ভাষা

সামবেদের ছন্দ ও ভাষার কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সমালোচক ফ্যাডেগান লক্ষ্য করেছেন সে সামবেদের স্বরপদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে বহুলাংশে পৃথক। আধুনিক পাঠক যখন ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠেন তখন উপভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতিও ভাব দৃষ্টি ইদানীং আকৃষ্ট হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরেই ঋগ্বেদের বিপুল সম্ভার অবিশ্বাস্য যথার্থতার সঙ্গে শ্রুতি-শিক্ষণের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অথচ সামবেদের গীতিপদ্ধতির সুরবিন্যাস ও মধ্যবর্তী বিরতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত, অজ্ঞ–কালের প্রবাহে এ স্বরন্যাস চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল। সাধারণভাবে অবশ্য কাব্য-ছন্দের উপরই সাংগীতিক ছন্দ নির্ভর করে। তবে কিছু কিছু পার্থক্যও রয়েছে, কেননা গানের ছন্দে শুধুমাত্র দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের মধ্যেই পার্থক্য রয়েছে–দুটি স্বরবর্ণমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের চরিত্র বা সংখ্যায় কোনও তাৎপর্য নেই। কথ্য বৈদিক ভাষা মূলত তিন প্রকার স্বরে বিন্যস্ত প্রযোজ্য এবং সেই সঙ্গে স্মৃতিতে বিধৃত স্তুতি ও প্রার্থনাগুলি মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করার জন্যও এই নিয়মই গ্রাহ্য। যেসব পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করতেন, একটি নির্দিষ্ট স্বরের বিন্যাসের মধ্যেই তাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হাত; কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এই স্বরবিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে প্রাকৃতভাষার উচ্চারণরীতির বেশ কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল।

ধ্বনি ও স্বরগ্রাম

ধ্বনি ও স্বরগ্রাম

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি হোতা ও তার সহকারীরা তিন প্রকার শ্বাসাঘাত-সহ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন, সামবেদের সূক্তগুলি উদ্গাতা ও তার সহায়করা বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন সুরে সংযোজিত হয়ে উচ্চস্বরে গীত হ'ত—তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে উপগাতাগণ কিছু একক একাক্ষর স্তোভের সঙ্গে যুক্ত ক'রে সেই গানে অংশ নিতেন। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত যজুঃসূক্তগুলি অধ্বর্যু ও তার সহায়করা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞকর্মের অঙ্গ হিসাবে উপাংশু রীতিতে অর্থাৎ মৃদুস্বরে, প্রায় গুণগুণ করে করতেন। স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজের

কাছে কন্ঠস্বর ও স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য কিছু প্রতীকী তাৎপর্যে গৃহীত হত। ঋগ্বেদের আবৃত্তিতে শ্বাসাঘাত ও স্বরগ্রাম সুক্তের বিষয়বস্তুতে কন্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন শুরুত্ব যোগ করত এবং এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের একমাত্রিক কথ্য ভাষার তুলনায় তার মধ্যে নতুনতর কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। নিম্নগ্রামে উচ্চারিত ধ্বনির সূত্রগুলিতে স্পষ্টতই এক ধরনের ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য ছিল। তাছাড়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যজ্ঞে বিঘ্ন-উৎপাদনকারী হিংস্র দানব ও পিশাচরা অর্থাৎ আর্যদের শত্রু প্রাগার্যগোষ্ঠীর মানুষরা যজ্ঞভূমির নিকট বিচরণ করত বলেই মন্ত্রের কিছু কিছু অংশ দুর্বোধ্য করে রাখারও প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন প্রাচীন যুগের সমস্ত ধর্মাচরণের মন্ত্রেরই ছিল যাতে পুরোহিতের গূঢ় জ্ঞানের সম্বন্ধে জনতা শ্রদ্ধাশীল থাকে। এভাবে আগত বৃহত্তর আর্যজনগোষ্ঠীর দর্শকদের কাছেও এইসব মন্ত্র গুপ্তই থেকে যেত যেহেতু এভাবেই তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা হত যে, অনুষ্ঠান পরিচালক পুরোহিতদের কাছেই শুধু তাদের তাৎপর্যবোধগম্য। একদিকে প্রার্থী ও তার উদ্দিষ্ট দেবতা, এবং অন্যদিকে জাদুকর ও শক্তিশালী অতিজাগতিক শক্তিসমূহের মধ্যে বহু বিচিত্র পার্থিব আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রয়োজনে মন্ত্রের মাধ্যমে যেন গোপন যোগাযোগ গড়ে তুলত

পুরোহিতরা। অধ্বর্যু প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজের জাদু-পুরোহিত বা শামানদের প্রধান কার্যকলাপের উত্তরাধিকারী হিসাবে এইসব ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; প্রাথমিক ধর্মীয় কার্যাবলীর কিছু অংশ অধ্বর্যু পরিশীলিত করে বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। বাকি অংশ রয়ে গেল জনজীবনের জাদুকর, প্রাচীন অগ্নি-পূজক পুরোহিত অর্থাৎ অথর্বাদের কাছে এবং বহু পরবর্তীকাল পর্যন্ত বৈদিক বাগ্ময়ে তার কোনো স্থান হয় নি। সংগীত বস্তুত বহুবিধ স্তরে যজ্ঞানুষ্ঠানে নুতন শক্তি যুক্ত করেছিল। নান্দনিক স্তর সম্পর্কে অবশ্য যথেষ্ট সংশয় রয়েছে; কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, সেই সুদূর অতীতে শব্দসমূহের জন্য অতিরিক্ত শক্তি জোগান দেওয়া ছাড়া সুরমূর্ছনার অন্য কোনো ভূমিকা ছিল কি না। বিখ্যাত সমালোচক সি. এম. বাওরা বলেছেন, 'অলৌকিক শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করাই ধর্মীয় সংগীতের লক্ষ্য।' ইন্দ্রজালের মাধ্যমে তা পরোক্ষভাবে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সূক্ত ও প্রার্থনার মাধ্যমেও সেটা করা যেতে পারে; তবে উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তব ফল লাভই তার অভীষ্ট। সঙ্গীত ইতিবাচক ও কার্যকরী ফললাভের জন্য উদিষ্ট ব'লেই শিল্পকলাকে পরিশীলিত করে উচ্চস্তরে উন্নীত করে, কেননা তা না হলে প্রার্থীর

প্রকৃত আকাঙক্ষা পূর্ণ না হলেও সংগীতের সম্মোহন তাকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। বহির্জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙক্ষা থেকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে দেখা দেয়-শব্দসমবায়ের মাধ্যমে ঐ পার্থিব বা অতিলৌকিক জগৎকে আয়ত্তাধীন করতে হয় বলে অত্যন্ত অনন্যসাধারণ কোনো শক্তি দিয়ে শব্দকে অন্তর্দীপ্ত করে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। এই 'অনন্যসাধারণ শক্তিই হল পবিত্র গীতির ঐন্দ্রজালিক উপাদান। আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র সমাজকে স্বতঃসম্মোহিত করে বলেই এ ধরনের ধর্মীয় গীতির প্রকাশশৈলী ও গায়ানরীতি লোকায়ত সংগীতের তুলনায় স্বরূপত ভিন্ন। ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় মহাকাব্য কালেহ্বলার মধ্যেও অনুরূপভাবে সৃষ্টিশীল ইন্দ্রজাল পরিস্ফুট হয়েছে। সংগীতের সম্মোহনী শক্তির তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা সামবেদের সঙ্গে সোমযাগের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করি; এই সোমযাগে শামান বা জাদু-পুরোহিতসুলভ সম্মোহনী সংগীতের প্রয়োগ ছাড়াও সম্মোহন বা উন্মাদনার দ্বিতীয় সহায়করূপে সোমরস ব্যবহার করা হত। পরিশীলিত, লোকায়ত সুরকে ঋগ্বেদীয় শব্দ-বিন্যাসে সন্নিবেশিত করে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তাই সামগানরূপে পরিচিতি লাভ করে-উদ্গাতা ও তার সহায়ক পুরোহিতগণ আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সেই সব সংগীত যজ্ঞকালে পরিবেশন করতেন। এদের মধ্যে শামান বা জাদু-পুরোহিত-সুলভ যে অর্থহীন চীৎকার রয়েছে, সেগুলি সম্ভবত অনুষ্ঠানে নিহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদবোধনের জন্য অনুষ্ঠানে একাত্ম হওয়ার মুহূর্তে সমগ্র সমবেত জনতা একসঙ্গে উচ্চারণ করত। এই সব চীৎকারকেই 'স্তোভ' বলা হত; এরা মুখ্যত দুই জাতীয়–পদ ও বাক্য। মূল পাঠে যা সন্নিবিষ্ট হত, তা কখনও ছিল বিচ্ছিন্ন পদ, কখনও বা সংক্ষিপ্ত বাক্য-সাধারণত দ্বিপদী শব্দ প্রযুক্ত হত। যেমন : হুব, হৌ, হোই, হাোবি, হাবু প্রভৃতি। স্পষ্টতই শ্রোতৃবর্গের সমবেত যোগদান বিশেষ প্রশিক্ষণলব্ধ পরিশীলিত সংগীতের অংশে সম্ভব হত না; আনুষ্ঠানিক সংগীত যেহেতু ঐন্দ্রজালিক ভীতি ও আশঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সাধারণ মানুষ জাদুপুরোহিতদের কার্যকলাপের প্রত্ন-স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়েই একই সুরে উচ্চ-গ্রামে চীৎকার করত। স্তোভের রহস্যময় উপাদান সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকগণ কৌতুহলাজনক মন্তব্য করেছেন। বস্তুত সামবেদের অধিকাংশ সংগীতের মূলে রয়েছে অতিলৌকিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সুরমূর্ছনায় নিহিত ইন্দ্রজাল সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও তার শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতা। প্রত্নকথাগুলি আবৃত্তি করে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যা অর্জন করতে চাইত বা মহাকালের প্রেক্ষিতে পরিস্ফুট ঘটনাপ্রবাহের পার্থিব নবরূপায়ণের মাধ্যমে যজুর্বেদ যেখানে

উপনীত হতে চাইত–সামবেদ সুরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী ছিল।

সংগীত বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করে–দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এটা লক্ষ্য করে প্রাচীন মানুষ তার মধ্যে রোগপ্রশমনের ক্ষমতা কল্পনা করে নিয়েছিল। সামবেদে সংগীতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত করা অর্থাৎ যজ্ঞের ভিত্তিস্থানীয় প্রার্থনাসমূহের পুরণ–এদের লক্ষ্য হিসাবে অতিজাগতিক শক্তিসমূহের নির্বিঘ্ন সক্রিয়তা বা সমাজগোষ্ঠীর জয়লাভ, স্বাস্থ্য বা সমৃদ্ধি—যাই থাক না কেন। যজমানের উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করার জন্য সক্রিয় বহুবিধ অপশক্তির মধ্যে রয়েছে শত্রু, দানব, ভূতপ্রেত ও পিশাচ। কতকটা তাদের এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্যই যেন সামবেদের স্তোত্রগীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। শুধু দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যই নয়, অশুভশক্তিকে পরাহত করার জন্য এবং আরও কিছু ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য উদ্গাতা অত্যন্ত রহস্যনিবিড় আঙ্গিকে আপনি সঙ্গীতাংশ যজ্ঞকালে পরিবেশন করতেন। নির্দিষ্ট কিছু অক্ষরের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে যে প্রত্নতান্ত্রিক গূঢ় বিদ্যার উপাদান রয়েছে, তার উৎস শামান বা জাদু-পুরোহিতের সৃষ্ট আনুষ্ঠানিক গীতির মধ্যেই নিহিত। এর সঙ্গে তুলনীয় অধ্বর্যু কর্তৃক ওম্, বট্, বেট্ বা বষট্-এর মতো অর্থহীন অক্ষর-প্রয়োগ, যাতে যজ্ঞানুষ্ঠান গোষ্ঠবহির্ভূত ব্যক্তিদের নিকট রহস্যময় হয়ে ওঠে; এতে সুচারুভাবে এই বিশ্বাসটিও প্রকাশিত হত যে, যজ্ঞনিষ্পাদক পুরোহিত এবং অতিলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে এমন এক নিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় সম্বন্ধ রয়েছে যা অদীক্ষিতদের নিকট একান্তই অনধিগম্য।

লক্ষ্যণীয় যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি 'যোনি' বলে অভিহিত হ'ত অর্থাৎ এই উৎস থেকেই সুরের জন্ম হয়েছিল। সম্ভবত এখানে এই ঐতিহাসিক তথ্য আভাসিত যে সুরে সংযোজিত হওয়ার বহু পূর্বে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি আবৃত্তির প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে উচ্চারিত শব্দের অতিলৌকিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রাধান্য পেয়েছে কেননা তা সৃজনশীল, অন্তর্গূঢ় শক্তিসম্পন্ন এবং 'নাস্তি'র গর্ভ থেকে তা অস্তিত্বের উৎপত্তি সূচিত করছে। সুর এই শব্দকেই সমুন্নীত করে এমন এক রহস্য-নিবিড় উচ্চতায় স্থাপিত করত যে তা শ্রোতার কাছে বহুগুণে শক্তিসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন হ'ত।

সামবেদ ও সোমযাগ

সামবেদ ও সোমযাগ

সামবেদের অন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সোমযাগের সঙ্গে তার সম্পর্ক। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, পূর্বার্চিকের দীর্ঘতম অংশ অগ্নি, ইন্দ্র ও পবমান সোমের প্রতি নিবেদিত তিনটি প্রধান অধ্যায়; আর উত্তরার্চিকের কেন্দ্রস্থলে এই তিনজন দেবতাই বিরাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অগ্নি, ধন ও গোসম্পদের ঐতিহ্যগত দাতা এবং দানব ও পিশাচের বিরুদ্ধে আর্য গোষ্ঠীগুলির রক্ষাকর্তা–সেই সঙ্গে তিনি যজ্ঞের ধারক বা দেবতাদের আহ্বানকারী ব'লেই যে কোনো যজ্ঞে সম্পূর্ণ অপরিহার্য। আক্রমণকারী আর্যবাহিনীর সেনাপতিরূপে যুদ্ধজয়ের গৌরবজনক নিদর্শনের অধিকারী ছিলেন বলেই ইন্দ্র আর্যদেবগোষ্ঠীর সর্বপ্রধান নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সোমযাগে তাঁর এক স্বতন্ত্র ভূমিকা–সোমরসপায়ীদের প্রধান-রূপে তিনি যেন যজ্ঞকারী সোমপায়ী পুরোহিতদের দৈব প্রতিভূতে পরিণত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, সোমাোযাগে তিনি প্রধান অতিথি এবং এইজন্য তাঁর প্রাধান্যও তর্কাতীত।

সোম একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। প্রাচীনতর পর্যায়ে সোমকে যজ্ঞের অন্যতম উপকরণরূপে নিছক উদ্ভিদ বলে মনে করা হত; কিন্তু পরবর্তীকালে সংঘটিত দৈবীকরণ প্রক্রিয়ার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সোমযাগে মোট সাত ধরনের পুরোহিত সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করতেন : মন্ত্র আবৃত্তিকারী ঋগ্বেদীয় হাোতা ও তার সহকারীরা, সামগায়ক উদ্গাতা, আহুতি-প্রস্তুতিকারী পোতা, যজ্ঞাগ্নিতে সোমরস ও ঘৃত নিক্ষেপকারী নেষ্টা, সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পরিদর্শক ও পরিচালক ব্রহ্মা বা উপদ্রষ্টা এবং বজ্র অর্থাৎ পলাশকাষ্ঠে তৈরি দণ্ড হাতে যজ্ঞভূমির তোরণের কাছে দণ্ডায়মান রক্ষঃ। এইসব পুরোহিত যজমানের সঙ্গে একত্রে সোমযাগের কেন্দ্রে বিরাজ করতেন। বস্তুত সোমযাগ যত জটিল ও দীর্ঘায়ত হয়েছে, বিভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিতের মধ্যে দায়িত্বভার বণ্টনও তত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের সোমমণ্ডল সঙ্কলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্মের ইতিহাসেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বান্তরের সূচনা হয়। ক্রমশ সোম রাজকীয় ক্ষমতা ও পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্বের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই সময় আর্যবসতিগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও সুসংগঠিত রাজকীয় ক্ষমতার ক্রমিক উত্থানেরও সূচনা হয়। ফলে সোমযাগ ক্রমশ বহুধাব্যাপ্ত ও ব্যয়বহুল হতে শুরু করে; বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোহিতসম্প্রদায় জটিল

অনুষ্ঠানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। এর ঐতিহাসিক সময়সীমা সম্ভবত ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ইতোমধ্যে আক্রমণকারী আর্যরা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ফেলেছিলেন; কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে তারা প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার মানুষের কাছে ইটের বাড়ি তৈরি করতে শিখে নিয়েছিলেন। তাছাড়া আদি প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে কিছু কিছু চারুকলাও আয়ত্ত করে তারা ধীরে ধীরে আর্যাবর্তের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কৃষিকার্য খুবই সহজসাধ্য, ভূমি উর্বরা ও সহজে কর্ষণযোগ্য হওয়ার ফলে আর্যরা অল্প আয়াসে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাদের উন্নতির অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে গোধন এবং ব্যাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে নৌবাণিজ্যের পুনর্যোগস্থাপন যা সিন্ধুসভ্যতার সময় প্রচলিত থাকলেও আর্যদের বসতিবিস্তারের প্রথম পর্বে কিছুকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে স্থগিত ছিল। এই সমস্ত কারণে আর্যদের দৈনন্দিন বাস্তবজীবন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় তাদের সামাজিক অস্তিত্ব ও তজ্জনিত সামাজিক চেতনা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে উদীয়মান স্বতন্ত্র গোষ্ঠীপতিদের শাসন প্রবর্তিত হচ্ছিল এবং প্রত্যেক শাসকেরই কিছু নিজস্ব ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কার্যবাহক ছিলেন। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এইসব রাজন্যগণ সম্পূর্ণ শান্তি ও মৈত্রীর বাতাবরণে বাস করতেন। এই পর্যায়ে আমরা প্রায়ই যে রাজসূয় বা বাজপেয়, সৌত্রিমণী ও অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ দেখতে পাই, তা অভ্রান্তভাবে ইঙ্গিত করছে যে, তখন প্রতিবেশী শাসকদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে ছিল রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কারণ প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীর রাজ্য অধিকার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। তাই অসংখ্য গৌণ অনুষ্ঠানের নির্দেশ সেই সময়কার রচণাগুলিতে পাওয়া যায় যার মধ্যে সমৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তারে অভিলাষী শাসকদের জন্য পালনীয় বিধিসমূহ যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর জাদুবিদ্যাকে প্রতিহত করার জন্যও বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "রাজকর্মণি" নামক রাজকীয় কর্তব্য-বিষয়ে অথর্ববেদের একটি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকীয় শত্রুর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য শাসকদের পক্ষে পালনীয় নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটেই সুনির্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে–রাজপুরোহিতরা অমাত্যদের সঙ্গে রাজকীয় কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে,

লোকায়ত বিষয়ে উপদেশদাতা ব্রাহ্মাণ-বংশজাত অমাত্যদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেষ্ট রাজপুরোহিতদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ খুব বিরল ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোহিতরা যে জাগতিক বিষয়েও শাসককে সহায়তা করতেন, তার প্রমাণ রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মাণে, যেখানে রাজা বিদেঘমাথব তাঁর পুরোহিত অগ্নিবহনকারী গৌতম রহুগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রাচ্য দেশের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, উদ্দেশ্য প্রাগার্য অধিবাসীদের বাসভূমি, ঊষর জমি ও আরণ্য অঞ্চল দন্ধ করে অধিকার করা। সন্দেহ নেই যে, পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন সমৃদ্ধতর সমাজের ধন রাজকোষগুলিতে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছিল, সমুদ্রপথে বাণিজ্য ক্রমবর্ধিষ্ণু ছিল, সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ক্রমাগত শাসক পরিবর্তন ঘটছিল এবং অধিক শক্তিশালী রাজন্যরা প্রতিবেশী ভূখণ্ডগুলির উপর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট ও সমর্থ ছিলেন–সেই সময়ে পুরোহিতশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পক্ষে দীর্ঘায়িত ও সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করার জন্য রাজন্যদের প্রভাবিত করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য ছিল না। অজ্ঞাত বিপদের ভয়-বিশেষত বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা, অধিকতর সমৃদ্ধিলাভের আকাঙক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার প্রত্যাশা-স্বভাবতই শাসকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে বিবেচিত হ'ত বলে তারা জটিল ও ব্যয়বহুল সোমযাগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সোমযোগে যে বর্ণনা পাই তা থেকে এটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটি অগ্নিহাোত্র, চার্তুমাস্য বা দর্শপুর্ণমাসের মতো একটি সহজে নিষ্পাদ্য স্বল্প ব্যয়ের যজ্ঞ নয়। এর জটিলতা, পুরোহিতবাহুল্য, আনুষঙ্গিক আড়ম্বর, দক্ষিণা ও যজ্ঞকর্মের ব্যয় এবং ব্যাপ্তি এমনই ছিল যে, অত্যন্ত ধনী রাজা বা রাজন্য ভিন্ন কেউই এ যজ্ঞ করতে পারতেন না। শাস্ত্রে দীর্ঘতম সত্র, সোমযাগ, দ্বাদশবর্ষ ধরে' অনুষ্ঠিত হ'ত; প্রত্নকথা অনুযায়ী সহস্রবৎসর ব্যাপী সোমযাগেরও নির্দেশ আছে। এই সময় থেকেই সোমযাগ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপে গণ্য হতে থাকে এবং সোম নিতান্ত উদ্ভিদ থেকে দেবতা এবং রক্ষক রূপে ব্রাহ্মণদের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। সোমমণ্ডল সংকলনের কাজও এ সময় শুরু হয়, যেহেতু বিষয়বস্তুরূপে সোমযাগের অবিসংবাদিত প্রাধান্য তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সোমের উত্থান ও দৈবীকরণের সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ব্রাহ্মণদের উত্থান অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আধিদৈবিক প্রতিরূপ রাজা সোমকে খুবই সুবিধাজনকভাবে জাগতিক শাসনের সীমার বাইরে স্থাপিত করা হ'ল। কারণ রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে স্পষ্ট বলা হত, রাজা প্রজাদের নিয়ন্তা, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজা

সোম; অর্থাৎ শ্রেণীগতভাবে ব্রাহ্মণ পার্থিব রাজার ক্ষমতার সীমার বাইরে রইল, তাদের ওপর রাজার প্রত্যক্ষ আধিপত্য অস্বীকার করা হল। সোমের একটি বহু ব্যবহৃত বিশেষণ 'রাজা'।

সামবেদের খাদ্য, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনাই অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। সেই সময়ের প্রধানতম যজ্ঞানুষ্ঠান সোমযাগটি যেহেতু বহু অনুপুঙ্খাযুক্ত ও বিপুল ব্যয়-সাধ্য ছিল, প্রচুর খাদ্যসামগ্রী তাতে ব্যবহৃত হত। সেজন্যে যজ্ঞধর্মহীন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে জীবিকাহীন ব্যক্তি লুণ্ঠনের জন্য প্রায় নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালাত। তাই সেই সময়ের সূক্তগুলিতে অনেক বেশি পরিমাণে শত্রুতাপরায়ণ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা রচিত হয়েছে। আবার ঐশ্বর্যের সঙ্গে একটু ভিন্ন ধরনের নিরাপত্তার অভাববোধও দেখা দিয়েছিল; সেই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্র-বাণিজ্য বিঘ্ন-সংকুল ছিল, খরা ও বন্যায় শস্যের ফলন মাঝেমাঝেই ব্যাহত হত, প্রাথমিকভাবে সমাজে যা ছিল শ্রমবিভাগ ইতোমধ্যে তা বংশানুক্রমিক বর্ণবিভাগে পরিণত হল, অভাবে ও সামাজিক বর্ণগত অবদমনে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনতার মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। ফলে সমাজের উচ্চস্তরের পুরোহিত ও রাজন্যদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। প্রধান ব্যয়বহুল শ্রৌত যজ্ঞগুলির উদ্ভাবন বৈদিক সমাজের জনসমুহকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল : একদিকে ছিল যজ্ঞ-আবিষ্কারক ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পৃষ্ঠপোষক ও পুরোহিতবর্গ, রাজা অমাত্য ও গোষ্ঠীপতিরা, রাজন্য ও অভিজাতবর্গ; অন্যদিকে রয়ে গিয়েছিল সমাজের বিপুল জনতা যারা নিতান্ত গৌণ ও তুচ্ছ ভূমিকায় পরোক্ষভাবে হয়ত বা অধিকাংশই কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হয়ে দূর থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা অনুষ্ঠানের পক্ষে সর্বতোভাবে নিষ্প্রয়োজন, যেন বহিরাগত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সময়ে সোমচর্য শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল; সোমযাগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকার ফলে একদিকে সামবেদ প্রাধান্য অর্জন করল এবং অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত রাজপুরোহিত ও অমাত্যদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকল। ঐশ্বর্যবান ও ক্ষমতাশালী রাজন্যরা যজ্ঞানুষ্ঠানের জাঁকজমক দেখানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হতেন বলে পুরোহিতশ্রেণী দক্ষিণা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বিস্তর দান,দক্ষিণা পেয়ে প্রভূতভাবে লাভবান হতেন। সুতরাং তাদের সোৎসাহ প্রচেষ্টায় সোমচর্য ও সামবেদ

যেমন সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে, তেমনি উত্তেজক পানীয় সোমরসের ব্যবহারের ফলেও সোমযাগ পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু একসময় এই সোমচর্য যেমন চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হল। তেমনি সোমবস্তুটি বিরল হয়ে যাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে বিকল্পরূপে উপস্থাপিত অন্যান্য উদ্ভিজগুলি উত্তেজক পানীয়রূপে আকাঙ্ক্ষিত ফলদানে অসমর্থ হওয়ায় সোমযাগের আবেদন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী সোমযোগে এত বেশিসংখ্যক পশু নিহত হ'ত যে কিছুকাল পরেই এই সম্পর্ক বেশ কিছু আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বস্তুত, বহু অনুপুঙ্খাযুক্ত ব্যাপ্তির আতিশয্য, জটিলতা ও অনুষ্ঠানের পৌনঃপুনিকতা থাকার ফলে সোমব্যাগের মধ্যেই যজ্ঞধর্মের ক্রমাগত অধোগতি সূচনা হয়েছিল। যদিও খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর হয় নি, আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে, সোমচর্য ও সামবেদের চূড়ান্ত সিদ্ধির দিনেই ক্ষয়প্রক্রিয়ারও সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্ররূপে সোম

চন্দ্ররূপে সোম

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী নৌ-বাণিজ্য সে সময়ে সমৃদ্ধতির হয়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্র নাবিকদের সমুদ্রযাত্রাকে পরিচালিত করত–সেই সব গ্রহনক্ষত্র জনসাধারণের কাছে অতিরিক্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্যাবিলন থেকে অর্জিত জ্যোতির্বিদ্যা ভারতীয়দের চিত্তলোকে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করায় ভারতবর্ষে তার চর্চা শুরু হল এবং তারকাপুঞ্জকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলা হল। সোমের দৈবীকরণ এবং আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে তার একাত্মীকরণ এই প্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। আর্যদের দেব-সঙ্ঘের বহু সৌর-দেবতা থাকলেও তখনও পর্যন্ত কোনো চান্দ্র দেবতা ছিল না, যা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বত্রই ছিল। সোমকে চন্দ্ররূপে উপস্থাপিত করে এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা হল। তারকা-পরিবৃত চন্দ্র যেন সামন্ত অভিজাতবর্গ ও সভাসদ-পরিবেষ্টিত পার্থিব রাজারই দৈবপ্রতিরূপ হয়ে উঠল। তাছাড়া, পাত্রে ঢেলে

দেওয়ার সময় ফেনিল শুভ্র সোমরসে শ্বেত শুভ্র চন্দ্রালোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা হ'ল। রাজা সোম ও উদ্ভিদ সোম আকাশ-বিহারী চন্দ্ররূপে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'ল।

সামবেদের উৎস

সামবেদের উৎস

সামবেদের সূক্তসমূহের উৎস রহস্যাবৃত, যেহেতু তা পরিচিত ইতিহাসের সীমাকে অতিক্রম করেছে। প্রস্ন-প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ গান গাইতে শিখেছিল। সমালোচক সি. এম. বাওরা বলেছেন যে, একদিকে নৃত্য থেকে গান সংগ্রহ করেছে ছন্দ এবং অন্যদিকে বাক্ থেকেও সংগীত ভাষাগত উপাদানে নিজেকে সৃষ্টি করেছে। সুর সন্নিবেশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যছন্দ গীতছন্দে রূপান্তরিত হ'ল; শব্দ সন্নিবেশিত হওয়ার পরে অর্থহীন একাক্ষর-কেন্দ্রিক সুর পূর্ণ–বিকশিত গানে পরিণত হ'ল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্বিংশতি শতাব্দীতে প্রথম নৃত্যের নিদর্শণ পাওয়া যায়; কোনও-না-কোন-ভাবে গান নিশ্চয়ই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে শামান বা জাদু-পুরোহিতরা অলৌকিক লক্ষ্য পূরণের জন্য গানের ব্যবহার করতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গানের প্রয়োগ বহু প্রাচীনকালেই আরম্ভ হয়েছিল–ঐন্দ্রজালিক এবং জাদু-পুরোহিতসুলভ কার্যকলাপ কিংবা দেবতার প্রতি প্রার্থনারাপেও গান ব্যবহৃত হত। গাভীর্যপূর্ণ ভাবনার অভিব্যক্তির প্রয়োজনে গানে লঘু-গতির ছন্দ বর্জন করা হ'ত; তবে গোষ্ঠীগত সম্মোহনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত দ্রুতগতির ছন্দ প্রযুক্ত হ'ত যাতে এক ধরনের আবেশের সৃষ্টি হয়।

সমস্ত ধর্মীয় সংগীতের প্রাথমিক উৎস হ'ল সাধারণ লোকগীতি, গোষ্ঠীজীবনে যে সুর নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করে; তবে এই সব সুর সূক্তে সন্নিবেশিত হওয়ার সময় অধিকতর ফলপ্রসু হওয়ার প্রয়োজনে বহুলাংশে পরিমার্জিত হয়েছিল। সামবেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রৌতিসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন চারণকবিদের পরিবারের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিমার্জনের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ও কালে কালে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছিল। তবে, লোকগীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে দূরে থেকে যারা নিষ্ক্রিয়ভাবে যজ্ঞে যোগ দিতে সমাজের সেই সব লোকের মনে গানের সুর নিশ্চিত

একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত; বিধিবদ্ধ স্বরভঙ্গি যখন পরিমার্জিত সুর ও আঙ্গিকগত সিদ্ধিসহযোগে নিরন্তর প্রচেষ্টায় ও পরিমার্জনে নান্দনিক স্তরে উন্নীত হয়ে শিল্পকুশলতা অর্জন করল, তখন পূর্বোক্ত সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি, বিশেষ মহত্বপূর্ণ পর্যায়ে তা উন্নীত করতে পেরেছিল। এই প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চলেছিল এবং ক্রমবর্ধমান সোমচর্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, সামবেদ নিছক প্রাচীনতর বৈদিক চারণকবিদের স্বতঃস্ফুর্ত উন্মাদনার অভিব্যক্তি নয়; নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় চর্যার ফলশ্রুতি এই বেদ, এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান। ঋগ্বেদের সূক্ত সমাজকে বাচনিক প্রত্নকথা ও স্বতঃস্ফুর্তি যোগান দিয়েছিল, অন্যদিকে আদিম গীতি তাদের সামনে মূল সুরের কাঠামোটি উপস্থাপিত করেছিল। এই সব সূক্ত ও গীতি সোমচর্যার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে যখন প্রত্নকথা, ধর্মচর্যা, সংগীত, ছন্দ, লয়, উত্তেজক পানীয় এবং তার আনুষঙ্গিক উন্মাদনা, ইচ্ছাপূরণের প্রত্যাশা ও সামাজিক কল্যাণের স্বাকল্পিত ধারণার এক জটিল আবহ নির্মাণ করল, তখন মূলগত রূপান্তরের মাধ্যমে এই সব সূক্ত ও গীতি তাদের আদিম অসংস্কৃত উৎস থেকে গুণগতভাবে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক একটি অভিব্যক্তি লাভ করেছিল।